# সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়— তারকারও ঊর্ধ্বে

জহর সরকার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং যাদের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়, তাদের পক্ষে এমন একজন প্রাণবন্ত, নিরহংকার মানুষের চলে যাওয়াটা মন থেকে গ্রহণ করা সত্যিই বেদনাবহ। আমি নিজে স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন, বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির এই বহুমুখী প্রতিভাবান কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বকে নিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য লিখতে বসব একদিন! তবে একথাও সত্যি যে বাঙালি মাত্রই অনুভব করেন তিনি তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলোর মতো অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল!

একবার আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'কতগুলি সিনেমাতে অভিনয় করেছেন, সৌমিত্রদা?' তাঁর সেই আকর্ষণীয় হাসিভরা মুখে তাঁর উত্তর ছিল, 'আমি হিসাব রাখিনি তো! আসলে এই নীরস সংখ্যার গণনাটা আমার কাছে খুবই ক্লান্তিকর।' তাঁর উত্তর সত্যি সেদিন আমাকে অবাক করেছিল। আসলে পঁচাশি বছরের জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত যিনি একের পর এক অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, অননুকরণীয় কণ্ঠে এবং উচ্চারণে হাজার হাজার কবিতার আবৃত্তি করেছেন, নিজে লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, আবার একইসঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হয়ে উঠেছেন মধ্যমণি তার পক্ষে এই গণনা নেহাতই ক্লান্তিকর। আমাদের মতো যারা বিভিন্ন সময়ে নানা অনুষ্ঠানে বা সান্ধ্য আসরে তাঁর সঙ্গে সময় কাটানোর সামান্য সুযোগ পেয়েছি, তারা এটা দেখে ও অনুভব করে অবাক হতাম যে সারাদিন অসংখ্য অভিনয়, অনুষ্ঠান ও কাজের মধ্যে কাটিয়ে এই মানুষটি দিনান্তে যখন উপস্থিত হচ্ছেন, তাঁর চোখেমুখে, শরীরী ভাষায় কোনও ক্লান্তির ছাপ পাওয়া যেত না। আবার আমি তাঁকে কখনও যুক্তিহীন খোশগল্প করতে বা অকারণ অভিযোগ অনুযোগ করে সময় কাটাতেও দেখিনি, বরং সমস্যাসংকুল সময় ও জীবন নিয়ে তাঁর যে আলোচনা বা মতামত তা সবসময়ই আমাদের আকৃষ্ট করেছে এবং দিশা দেখিয়েছে।

মঞ্চ ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রেম। তাই অসংখ্য সফল চলচ্চিত্রে অভিনয় এবং খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেও এই কিংবদন্তি মানুষটি কখনওই নাটক ও মঞ্চ ছেড়ে যাননি। সেই কৈশোরকালের প্রেম এই থিয়েটারের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন দিকপাল অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু সবসময় তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরও একজনের প্রেরণার কথা স্মরণ করতেন, তিনি হলেন তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী নাট্যব্যক্তিত্ব মৃত্যুঞ্জয় শীল। আর পঁচাত্তর বছর বয়সে শেক্সপিয়ারের 'King Lear' নাটকের বঙ্গীকরণ 'রাজা লিয়ার'-এ তাঁর অভিনয় যে মাত্রায় পৌঁছে ছিল সেটা এই থিয়েটার-অন্ত মানুষটির মহীরুহ হয়ে ওঠার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে অবশ্যই।

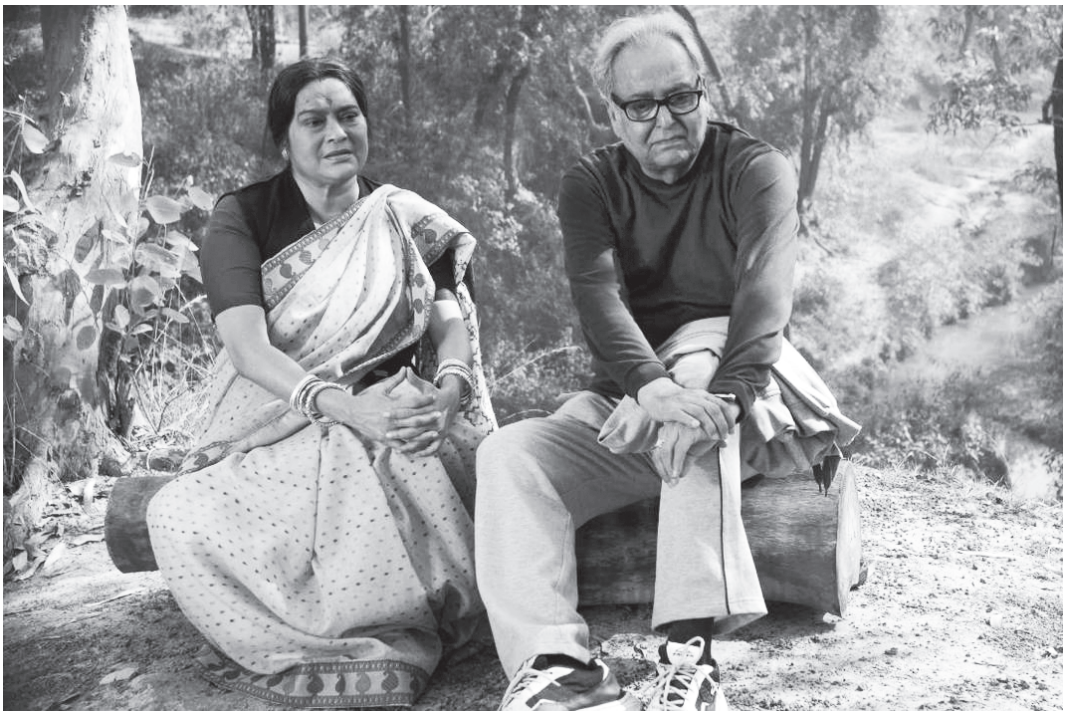

*বেলাশেষে: স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর সঙ্গে*

আমার মনে পড়ে যাচ্ছে অক্টোবরের শুরুতে অতিমারি করোনায় সংক্রমিত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সপ্তাহ খানেক আগে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সমসাময়িক নাট্যব্যক্তিত্ব অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় হঠাৎই মৃত্যু নিয়ে কিছু দার্শনিক উচ্চারণ করেছিলেন। সেটাই সম্ভবত তাঁর জনসমক্ষে শেষ বলা এবং কোন এক অবোধ্য কারণে সেদিন তিনি মৃত্যুর মতো এক জটিল বিষয় নিয়ে কিছু সময় ব্যয় করেছিলেন। ক্লান্ত অবসন্ন গলায় মৃত্যু কীভাবে কোনওরকম আগাম জানান না দিয়ে জীবনকে নিয়ে যায় সে কথা বলেছিলেন। আমাদের বিশেষভাবে ঘা দিয়েছিল যে কথাটা, সেটা হল তিনি বলেছিলেন যে জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে মৃত্যুকে দোষারোপ করাটাও একটি অতি সরলীকরণ বিষয় বলে তাঁর মনে হয়। তারপর সৌমিত্রদা যেন একরাশ ক্লান্তি ও একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে অসিতবাবু ও তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে বলতে শুরু করলেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে যদি বাঙালি সংস্কৃতির একটি খাঁটি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা সংস্কৃতির 'রেনেশাঁ পুরুষ' বা অবিসংবাদী প্রতিভূ হিসাবে চিহ্নিত করি তাহলে আমার মনে হয় সেটি একটুও অতিশয়োক্তি হবে না। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বম্বের চলচ্চিত্রেও পদার্পণ ঘটেছে, কিন্তু তিনি কখনওই এর জন্য অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেননি। বরং তিনি আমাদের কফি হাউসের ধোঁয়া ও কফি কাপের তুফানে অনেক বেশি সহজ, সাবলীল বাংলার ঘরের ছেলে হয়ে বাংলা শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা ও আলোচনাতে মেতে ওঠাকেই বেশি পছন্দ করেছেন। মজার বিষয় হল তিনি নাকি তাঁর চেহারা সিনেমার উপযুক্ত নয় মনে করে সিনেমাতে সেভাবে শুরুতে চেষ্টাই করেননি যতক্ষণ না সত্যজিৎ রায় সেটিকে ভুল প্রমাণিত করে তাঁকে আমাদের সামনে হাজির করেন ১৯৫৯ সালে, বয়স মাত্র ২৪ বছর তখন। চলচ্চিত্র শিল্পে এসেও তিনি নিজেকে তারকা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা না করে অভিনেতা পরিচয়কেই ধরে রাখতে চেয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে পাশের বাড়ির সুন্দর দেখতে

যুবকটির মতো চেহারা নিয়ে সেসময়ে খ্যাতির মধ্যগগনে থাকা উত্তমকুমার যেমন তাঁর ভুবন ভোলানো চোখ ও হাসি দিয়ে দর্শকসাধারণকে মাতিয়ে রেখেছেন সেরকমটা তিনিও করবেন, এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করাই শ্রেয়। সেই ১৯৬০ সাল থেকে বাংলার দর্শককুল উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে কত তুলনা করে চলেছে বা প্রতিযোগিতা দেখেছে! কিন্তু উত্তমকুমার তাঁর বিশালত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সামান্য ম্লান করলেও, বিচক্ষণ দর্শক মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন যে দু'জনেই তাঁদের নিজস্ব প্রতিভা, অভিনয় ধারা ও ঘরানার মধ্য দিয়ে বিশেষ নিজস্ব ছাঁচ তৈরি করে উৎকর্ষতার চরমে পৌঁছেছেন আলাদা আলাদাভাবে। উত্তমকুমার ও সৌমিত্র একসঙ্গে ছয়টি সিনেমাতে অভিনয় করেছেন এবং সৌমিত্রদা নির্দ্বিধায় চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'ঝিন্দের বন্দী' চলচ্চিত্রে ডাকাবুকো রোমান্টিক নায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে খলনায়কের ভূমিকায় শক্তিশালী অভিনয় করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংবেদনশীল শিল্পীসত্তা এবং অপরিসীম স্বাভাবিক অভিনয়ের গুণাবলিকে কাজে লাগিয়ে সত্যজিৎ রায় চোদ্দোটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়ে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করিয়েছেন। 'অপুর সংসার'-এর সহজ সাবলীল অপু চরিত্রে হোক, কিংবা 'চারুলতা'র (১৯৬৪) সংস্কৃতিবান অমল চরিত্র হোক, সবেতেই অবাধ বিচরণ তাঁর। 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩)-এর সংকটগ্রস্ত গঙ্গাচরণ চরিত্র কিংবা প্রখর-মস্তিষ্ক গোয়েন্দা ফেলুদার কথা ভাবি না কেন, তাঁর সাবলীল চরিত্রায়ন সবসময়ই দর্শক সমালোচকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। এই অসম্ভব শক্তিশালী বৌদ্ধিক অভিনেতা সেসময়ের জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে যেমন সফলতার সঙ্গে রোমান্টিক নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে মন জয় করেছেন, সাম্প্রতিক সময়েও সমস্যা জর্জরিত বৃদ্ধের চরিত্রে সংবেদনশীল অভিনয় করে একইভাবে চমকে দিয়েছেন এই প্রজন্মকে। এর দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'বেলাশেষে' (২০১৫) এবং 'ময়ূরাক্ষী' (২০১৭)। এ যেন সৌমিত্র নামক এক অনুকরণীয় অভিনয়শৈলী, একটি ব্র্যান্ড, সে তাঁর পরিচালক তপন সিংহ হোন বা তরুণ মজুমদার হোন কিংবা মৃণাল সেন। আবার এসময়ের একেবারে উঠতি পরিচালকদের কাছেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পথপ্রদর্শক এবং অসম্ভব ভরসার জায়গা।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'পদ্মভূষণ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যখন, তখন তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা আরও অনেক বেশি। তিনিই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রব্যক্তিত্ব যিনি ফ্রান্সের শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'Ordere Des Arts er Des Lettres' অর্জন করেছেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০১২ সালের অবশ্য তিনি ভারতের চলচ্চিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান

*ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান 'Ordere Des Arts er Des Lettres'*

'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার'এ সম্মানিত হন। আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে জাতীয় পুরস্কার প্রাপকদের সম্মানে জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভায় এই কিংবদন্তি অভিনেতার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তিনি বাস্তবিক খুবই আনন্দিত ও উল্লসিত ছিলেন, একইসঙ্গে আবার একটু বিরক্তি অনুভব করছিলেন সেই জাঁকজমকতার মধ্যেই একটু শান্ত একটা পরিবেশের জন্য এবং তাই ফিসফিস করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেছেন। তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন কতবার, কিন্তু তিনি সেই অতিশয় জাঁকজমক থেকে মুক্তি পেয়ে নিরিবিলি পরিবেশে বৌদ্ধিক আড্ডার আশায় বেরিয়ে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। আমি নিশ্চিতভাবে লক্ষ করেছিলাম সেই সন্ধ্যায়, যে বিরক্তিভরা মুখে অভিনেতার মুখোশ একদমই ছিল না। ২০১৭ সালেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'Legion d' Honneur'এ ভূষিত হন, যে সম্মানে তাঁর অভিনীত আমাদের প্রিয় ফেলুদা, অপু চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা মহান পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও সম্মানিত হয়েছিলেন।

*লেখকের সঙ্গে*

তাঁর অসংখ্য লেখা নাটক কিংবা তাঁর আঁকা ছবি নিয়েও অনেক আলোচনা চলতে পারে কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে করতে এই মুহূর্তে ভালো লাগছে সেটা হল তাঁর 'এক্ষণ' নামক একটি মূল্যবান পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ। নির্মাল্য আচার্য, যাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য সন্দেহাতীত, তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই অগ্রণী প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার প্রতিভাবান এবং বৌদ্ধিক পাঠকদের কথা মনে রেখে। সে প্রায় ষাট বছর আগের কথা, তাঁরা দুজন শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে 'কথাশিল্প' অফিসে নিয়মিত বসতেন যেখানে আবার অরাজনৈতিক বামমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের অবাধ বিচরণ ছিল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও একজন আদ্যন্ত বামমনস্ক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমরা দেখেছি এ রাজ্যের পূর্ববর্তী বাম সরকারের সংকটকালে যখন তারা জনগণের ক্ষোভ ও রোষের শিকার, সেসময়েও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বামপন্থায় বিশ্বাস টাল খায়নি। তবে তিনি কখনওই আগ্রাসী মানসিকতা প্রকাশ করতেন না। তিনি সবসময়ই স্বনিয়ন্ত্রিত থেকেছেন এবং কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছেই শিরদাঁড়া বিক্রি করেননি। তাঁর কাছাকাছি থাকা বন্ধু স্বজনদের অনেকেই জানেন যে তিনি বর্তমান উগ্র হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্রীয় শাসনের ভূমিকা ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও তিনি সরব ছিলেন। আমরা যখন তাদের উগ্র নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে গিয়েছি, তখনই তাঁর স্বচ্ছ মতামত ও সহমর্মিতা আমাদের সাহস সঙ্গে জুগিয়েছে। তাই যখন তাঁর মৃত্যুতে শক্তিশালী কোনও জাতীয় নেতার শোক-সংবাদ টুইট পড়ি কিংবা তাঁর শেষযাত্রায় কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া নেতা-নেত্রীদের দেখি তখন একথা নিশ্চিত বলা যায় সারাপথ জুড়ে সৌমিত্রদা অবশ্যই মুচকি মুচকি হেসেছেন শুধু।